নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৫, পৃ: ১১৪-১৩৪
©২০০০ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

জুমিয়া থেকে জুম্ম: পার্বত্য চট্টগ্রামের জুমচাষ-নির্ভর জনগোষ্ঠীদের ঔপনিবেশিক রূপান্তরের ইতিহাস

প্রশান্ত ত্রিপুরা*

ভূমিকা

প্রতিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির সাথে এথনিকতার[১] সম্পর্ক অধ্যয়ন নৃবিজ্ঞান তথা অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানে নূতন নয়। যেমন, বার্থ দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে একই এলাকায় বসবাসরত একাধিক এথনিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবেশগত অভিযোজনে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় (Barth 1956)। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় পরিসরে এথনিক পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে প্রতিযোগিতার প্রতি অনেকেরই বিশ্লেষণ নিবদ্ধ হয়েছে (Despers 1975)। তবে এই উভয় ধরনের বিশ্লেষণের একটা সীমাবদ্ধতা হল, এসব ক্ষেত্রে এথনিক পরিচয়কে ঐতিহাসিকভাবে উন্মোচিত করার তেমন চেষ্টা থাকে না, দেখা হয় না এ পরিচয় নির্মাণের পিছনে কি ধরনের সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া কাজ করে। সাম্প্রতিককালে ঠিক এই শেষোক্ত বিষয়টার প্রতিই অনেকে মনোযোগ দিয়েছেন, তাঁরা দেখার চেষ্টা করেছেন কিভাবে এথনিক বা জাতীয় পরিচয় ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত হয়, এবং এই নির্মাণের সাথে কি ধরনের সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া যুক্ত থাকে (Roosens 1989, Anderson 1991)। অবশ্য এথনিক বা জাতীয় পরিচয়ের সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত চরিত্রের উপর জোর দেওয়ার অর্থ এই নয় যে এসব পরিচয় অবাধে তৈরী হয় বা তৈরী করা যায়। যে প্রশ্নটা রয়ে যায় তা হল, ভৌগোলিক পরিবেশ, অর্থনীতি প্রভৃতির মত বিষয় ঠিক কখন কতটা কিভাবে এই নির্মাণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, এবং এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের কাছে উক্ত বিষয়গুলো কি ধরনের অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে? এই নিবন্ধে এ ধরনের প্রশ্নের একটা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রেক্ষিতে। সুনির্দিষ্টভাবে যে বিষয়টার উপর এই নিবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে, তা হল, জুমচাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণার সাথে এই কৃষি-পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমি ও জনগোষ্ঠীদের নিয়ন্ত্রণের বিবিধ উদ্যোগের ঐতিহাসিক সম্পর্ক।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকাগুলোর তুলনায় এর ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কারণে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। লক্ষ্যণীয় যে, এ এলাকায় জনসংহতি সমিতি পরিচালিত সশস্ত্র

---

* শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আন্দোলনের অংশ হিসাবে 'জুম্ম' জাতীয়তার যে ধারণা আধুনিককালে তৈরী হয়েছে, তা ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'জুম' শব্দের সাথে সম্পর্কিত (van Schendel 1992; ভান সেন্দেল ১৯৯৮), যার আক্ষরিক অর্থ হল 'জুমিয়া'।[২] তবে সম্পর্কটা শুধুমাত্র ব্যুৎপত্তিগত নয়। ঐতিহাসিকভাবে দেখতে গেলে বলতে হয়, জুম্ম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পেছনে আর্থ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের যে বোধ ক্রিয়াশীল ছিল, তার পেছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় নীতিমালার মাধ্যমে জুমচাষ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ইতিহাস। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করে অঞ্চলটাকে তাদের শাসন ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসে, তখন সেখানে মূলত ব্রিটিশরা যাদের 'হিল মেন' বলে আখ্যায়িত করেছিল, তারাই বসবাস করত (Lewin 1869)। এই 'হিল মেন' বা 'পাহাড়ী'দের অবশ্য কোন অভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয় ছিল না বা আগে তারা কোন একক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় বাস করত না।[৩] তারা বাস করত জ্ঞাতিসম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গ্রামীন সামাজিক সংগঠনের আওতায়, এবং প্রায় বারোটার মত এথনিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। ব্রিটিশরা এই এথনিক গোষ্ঠীগুলোকে 'ট্রাইব' বা 'উপজাতি' হিসাবে চিহ্নিত করলেও তাদের সকলের মধ্যে প্রাক-রাষ্ট্রীয় গোত্র-সংগঠন একইভাবে ক্রিয়াশীল ছিল না, বরং এই গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিবেশী প্রাক-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর (আরাকান, ত্রিপুরা, মোগল সাম্রাজ্য) সাথে সমন্বিত বা সম্পর্কিত ছিল। এসব 'উপজাতীয়' গোষ্ঠীর অবশ্য একটা বিষয়ে মিল ছিল, তারা সবাই অর্থনৈতিকভাবে মূলতঃ জুমচাষের উপর নির্ভর করত। কাজেই 'জুম্ম' নামটার ব্যুৎপত্তি জানা ছাড়াও এই পরিচয়ের আবির্ভাবের পেছনে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া কাজ করেছে, তা বোঝার জন্য জুমচাষের প্রতিবেশগত ও রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা দরকার।

নীচে আমি প্রথমে নৃবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটে জুমচাষ ও অনুরূপ অন্যান্য চাষপদ্ধতির কিছু মৌলিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করব। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষের ইতিহাস পর্যালোচনা করার ক্ষেত্রে শুরুতে আমি প্রাক-ঔপনিবেশিক কালে জুমচাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি কেমন ছিল, সে সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। এর পর পর্যায়ক্রমে ঔপনিবেশিক ও 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' শাসনামলে ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টিকোণ থেকে জুম সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাসমূহের পর্যালোচনা করে এগুলির একটা মূল্যায়ন তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামে উদ্ভাবিত 'জুম্ম' জাতীয়তার ধারণার সাথে 'জুম' ও 'জুমিয়া'দের সম্পর্ক আমি পরীক্ষা করে দেখব। আমার বিশ্লেষণের জন্য যে ধরনের উপাত্ত আমি ব্যবহার করেছি, সেগুলোকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে রচিত বিভিন্ন বইপত্র, যেগুলোর একটা বড় অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত এলাকাসমূহে প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা, এগুলোকে শুধুমাত্র ঐ

সমস্ত এলাকা সম্পর্কে তথ্যের উৎস হিসাবে না দেখে ব্রিটিশ প্রশাসকদের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর দলিল হিসাবেও বিবেচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বেড়ে ওঠার সুবাদে জুমচাষ ও জুমচাষীদের সম্পর্কে আমার নিজের কিছু ধারণা ও অভিজ্ঞতা আগে থেকেই ছিল, এগুলোর পাশাপাশি আমার অসমাপ্ত পিএইচডি গবেষণার অংশ হিসাবে সম্পাদিত মাঠকর্ম হল এ নিবন্ধে উপস্থাপিত অনেক তথ্য ও পর্যবেক্ষণের উৎস।[৮] তৃতীয়তঃ বিভিন্ন অপ্রাথমিক উৎস থেকে আহরিত তথ্য, মতামত প্রভৃতি এ নিবন্ধে প্রাসঙ্গিকভাবে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা হয়েছে।

জুমচাষ: 'স্থানান্তরিক কৃষি'র একটি স্থানিক রূপ

কৃষির একটা বিশেষ ধরনকে বোঝানোর জন্য ইংরেজীতে shifting cultivation, slash and burn, extensive agriculture, horticulture, swidden agriculture প্রভৃতি শব্দ/শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়। সবক্ষেত্রে সমার্থক না হলেও এগুলি একত্রে কৃষির অপেক্ষাকৃত অনিবিড় একটা ধরনকেই নির্দেশ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের কৃষি-ব্যবস্থা বিভিন্ন স্থানিক নামে পরিচিত। এরকমই একটি আঞ্চলিক নাম হচ্ছে 'জুম' (বানান/উচ্চারণভেদে 'ঝুম'), যা বাংলা ভাষায় প্রচলিত এবং ব্রিটিশদের মাধ্যমে এ অঞ্চল (বাংলা, বিহার ও আসামসহ ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় বিভিন্ন রাজ্য) নিয়ে লেখা ইংরেজী বইপত্রেও জায়গা করে নিয়েছে। চাকমা ভাষায়ও 'জুম' শব্দটি প্রচলিত, তবে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য এলাকায় একাধিক স্থানিক শব্দ রয়েছে, যেগুলো বাংলাভাষীদের কাছে খুব একটা পরিচিত নয়। এ নিবন্ধে 'জুম' বা 'জুমচাষ' বলতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের অন্যান্য পাহাড়ী অঞ্চল ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে এ নামে পরিচিত কৃষি-ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। আর ইংরেজী shiftinng cultivation, swidden agriculture প্রভৃতির সমার্থক হিসাবে 'স্থানান্তরিক কৃষি' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

সাধারণভাবে স্থানান্তরিক কৃষিব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করে ভূমি ও জনসংখ্যার অনুপাতের উপর। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিক কৃষির যেসব ধরন রয়েছে, সেগুলির দুটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, জঙ্গলাকীর্ণ জমি কেটে সাফ করে তাতে আগুন লাগিয়ে আবাদ করা হয়, এবং একই জমিতে একনাগাড়ে চাষ না করে গড়পড়তাভাবে আবাদের মেয়াদের চাইতে দীর্ঘতর মেয়াদের জন্য সেটাকে পতিত-জমি হিসাবে ফেলে রাখা হয় (Conklin 1957:1-2)। অর্থাৎ একবার ব্যবহৃত জমি প্রাকৃতিক উপায়ে আবার জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত সেখানে একই পদ্ধতিতে পুনরায় চাষ করা হয় না। প্রতিবেশগত বিবেচনায় গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনাঞ্চলসমূহে মাটির আপেক্ষিক অনুর্বরতার প্রেক্ষিতে এই ধরনের কৃষির অভিযোজনশীলতা রয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। যেমন, নৃবিজ্ঞানী গিয়ার্টজের মতে, স্থানান্তরিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বনভূমির আদলে, এই অর্থে যে এই ব্যবস্থার আওতাধীন একটা কৃষিক্ষেতের সাথে গ্রীষ্মমন্ডলীয়

বনাঞ্চলের প্রতিবেশগত সাদৃশ্য রয়েছে প্রজাতি-বৈচিত্র্য, মাটির পরিবর্তে জীবন্ত উদ্ভিদ-প্রাণী প্রভৃতির ভেতরেই অধিক হারে নিউট্রিয়েন্ট সঞ্চিত থাকা, ইত্যাদির দিক থেকে (Geertz 1963:16-25)।[৫] স্থানান্তরিক কৃষিব্যবস্থায় সচরাচর একই জমিতে একসাথে বিভিন্ন ফসল ফলানো হয়, যা গিয়ার্টজের বিবেচনায় গ্রীষ্মমন্ডলীয় বনাঞ্চলের প্রজাতি-বৈচিত্র্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এদিক থেকে একটা জুমক্ষেতকে আশেপাশের বনাঞ্চলের একটা ক্ষুদ্র মানব-সৃষ্ট সংস্করণ হিসাবে দেখা যায়।

গিয়ার্টজের মূল্যায়ন অবশ্য সব ধরনের স্থানান্তরিক কৃষিব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিশেষ করে পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই বাজার-মুখী উৎপাদনের কারণে এসব ব্যবস্থার আওতায় ফসলের বৈচিত্র্য হ্রাস পেয়েছে, এবং অনেকক্ষেত্রে জমিতে শুধু একটা ফসলই উৎপাদিত হতে দেখা গেছে। এসমস্ত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বেশ আগে কংক্লিন জোর দিয়েছিলেন বিভিন্ন ধরনের স্থানান্তরিক কৃষিকে একই কাতারে না ফেলে প্রেক্ষাপট অনুসারে এদের মধ্যেকার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসমূহের প্রতি নজর দেওয়ার উপর (Conklin 1957:2-3)। যেমন, কোন কোন জায়গায় একই জমিতে স্থায়ীভাবে চাষাবাদ করতে অভ্যস্ত কৃষকরাও আংশিকভাবে স্থানান্তরিক কৃষির উপর নির্ভর করে, আবার অন্যত্র এই নির্ভরশীলতা সামগ্রিক। কংক্লিনের পর্যবেক্ষণ হল, যেখানে স্থানান্তরিক কৃষি একটা আংশিক ব্যবস্থা মাত্র, সেখানে একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার তুলনায় একই জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল একত্রে ফলানোর প্রবণতা কম। এছাড়া সমকালীন প্রেক্ষাপটে স্থানান্তরিক কৃষি ব্যবস্থার আওতায় রাসায়নিক কীটনাশক, সার প্রভৃতির ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায় (cf. Greenland 1975)।[৬]

মানুষের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে প্রত্ন-নৃবিজ্ঞানী চাইল্ডের (Childe 1941) অনুসারীরা 'নব্যপ্রস্তর' যুগে কৃষির (এবং সেসাথে গবাদিপশু পালনের) সূচনাকে একটা বিপ্লব হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রেক্ষিতে বিবর্তনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানান্তরিক কৃষিকে 'নব্যপ্রস্তর' যুগে উদ্ভাবিত কৃষিব্যবস্থার সমকালীন প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, সে সাথে এই কৃষিব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীদেরও সাংস্কৃতিকভাবে 'আদিম' হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান সমস্যা হল এই যে, 'নব্যপ্রস্তর' যুগে যখন কৃষির বিকাশ ঘটেছিল, তখন প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রভৃতি ছিল একেবারে ভিন্ন, এবং পৃথিবীকে বিভিন্ন রাষ্ট্র ভাগাভাগি করে নেয় নি। সচরাচর ধরে নেওয়া হয় যে মানব ইতিহাসে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় সংগঠনের আওতায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজ বা তথাকথিত প্রাচীন 'সভ্যতা'সমূহ গড়ে উঠেছিল নিবিড়তর কৃষি-ব্যবস্থার ভিত্তিতে। তবে স্থানান্তরিক কৃষিও যে 'সভ্যতা' বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্তের যোগান দিতে পারে, তারও নজির রয়েছে (উদাহরণ হিসাবে Dumond 1961-এর আলোচনা দেখা যেতে পারে)। সে যাই হোক, সমকালীন স্থানান্তরিক কৃষি-নির্ভর সমাজসমূহ স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে অভিযোজনের পাশাপাশি রাষ্ট্র, বাজার ব্যবস্থা প্রভৃতির সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমেই

টিকে রয়েছে, এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিলে তাদের কোন অবস্থাতেই 'নব্যপ্রস্তর' যুগের প্রতিনিধি হিসাবে যে গণ্য করা যায় না, একথা সমকালীন নৃবিজ্ঞানীদের প্রায় সবাই একবাক্যেই স্বীকার করবেন।

প্রাক-ব্রিটিশ আমলে জুমচাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি

প্রাক-ব্রিটিশ আমলের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জুমচাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলা দুস্কর, কারণ এই অঞ্চলটা তখন সুনির্দিষ্ট বা স্থায়ী কোন রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে ছিল না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের 'পাহাড়ী' জাতিসমূহের সাথে ঐতিহাসিকভাবে ত্রিপুরা, আরাকান ও মোগল রাষ্ট্রের বিভিন্ন মাত্রার সম্পর্ক ছিল। লুইন (Lewin 1869:28) এই জাতিসমূহকে মারমাদের মধ্যে প্রচলিত একটি শ্রেণীকরণ অনুসারে দুইটি বর্গে ভাগ করেছিলেন: 'খিয়ংথা' বা 'নদিতীরবাসী' এবং 'টংথা' বা 'পর্বতবাসী'।[৭] প্রথমোক্ত বর্গে অন্তর্ভুক্ত ছিল মারমা ও চাকমাদের মত জনগোষ্ঠী, যারা সচরাচর নদীর তীরে বা নীচু পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশে বাস করত; এই গোষ্ঠীগুলো অন্যদের আগেই ব্রিটিশ প্রভাব বলয়ে চলে এসেছিল। দ্বিতীয় বর্গে অন্তর্ভুক্ত ছিল ম্রো, বম, লুসাই প্রভৃতি জনগোষ্ঠী, যাদের লোকালয়গুলো সচরাচর অপেক্ষাকৃত প্রত্যন্ত এলাকার পর্বতশ্রেণীর শিখরদেশে অবস্থিত ছিল; এদের মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠী, যেমন লুসাইরা, প্রথমদিকে পুরোপুরি ব্রিটিশ শাসনের আওতা বহির্ভুত ছিল। প্রাক-ব্রিটিশ আমল থেকে লুসাইসহ যেসব গোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর বশ্যতা স্বীকার করত না, তারা অতীতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীদের উপর হামলা করে নরমুন্ড, দাস প্রভৃতি সংগ্রহ করত বলে জানা যায়। এ অঞ্চলের ইতিহাসে এরাই 'কুকী' নামে পরিচিতি পেয়েছে (এ নামে বর্তমানে কোন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব পার্বত্য চট্টগ্রামে নেই)। লুইনের দেওয়া বিবরণ থেকে জানা যায়, বাঙালীরা চট্টগ্রাম জেলার সীমান্তবর্তী এলাকার 'বন্ধুভাবাপন্ন' উপজাতিগুলোকে 'জুমিয়া' (Joomah)[৮] বলে অভিহিত করত, এবং অন্যদের, বিশেষ করে যারা বাংলা বলতে পারত না তাদের, 'কুকী' হিসাবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করত (Lewin 1869:28)।

এ ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'পাহাড়ী' জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র ও বাজারব্যবস্থার আওতায় চলে এসেছিল, তাদের একটা আলাদা পরিচিত ছিল। চাকমা ও মারমারা তাদের 'রাজা'দের মাধ্যমে মুগলদের কার্পাস-কর দিত (পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল তখন কার্পাস-মহল নামে পরিচিত ছিল) এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের হাটবাজারের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চল মুগলদের শাসনে আসার আগে এই জনগোষ্ঠীগুলো আরাকান রাষ্ট্রের, বা কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাষ্ট্রের, আওতায় বাস করত বলে ধারণা করা যায়। অর্থাৎ এই জনগোষ্ঠীসমূহের অন্তর্ভুক্ত জুমিয়া কৃষকদের উপর প্রাক-ঔপনিবেশিক আমল থেকেই সামান্য হলেও করের বোঝা ছিল। অন্যদিকে 'কুকী'দের মত

জনগোষ্ঠীদের উপর এ ধরনের করের বোঝা না থাকলেও, বা তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগঠিত না হলেও, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া ছিল, যেমন মাঝে মধ্যে 'কুকী'দের সামরিক সহায়তা নিত অনেক রাজারা। আর লুইনের দেওয়া তথ্য ঠিক হয়ে থাকলে 'কুকী'রা পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীদের উপর হামলা চালিয়ে দাস সংগ্রহ করত, যাদের জুমক্ষেতে কাজ করানো হত। প্রাক-ঔপনিবেশিক আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালী কৃষকদের কোন বসতি গড়ে না ওঠার প্রধান কারণ সম্ভবতঃ ছিল 'কুকী' হামলার ভয়। শুধু বাঙালী কেন, চাকমা ও ত্রিপুরাদের মত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও কুকী-ভীতি ছিল (এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কিংবদন্তী এখনো প্রচলিত রয়েছে), ফলে অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাদের জন-বিস্তৃতি এখনকার মত ব্যাপক ছিল না। ব্রিটিশরা 'কুকী'দের দমন করার পরই ধীরে ধীরে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এবং সবশেষে বাঙালী জনপদ এ অঞ্চলের অভ্যন্তর ভাগে বিস্তার লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টির একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কুকীদের দমন করা (Lewin 1869; McKenzie 1884:Chapter XXII)।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের দৃষ্টিতে জুমচাষ

পৃথিবীর যেসব জায়গায় স্থানান্তরিক কৃষির ভিত্তিতে মোটামুটি স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা দীর্ঘসময় ধরে টিকে ছিল, সেসব জায়গায় জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল অপেক্ষাকৃত কম এবং জনসংখ্যার অনুপাতে বনজ সম্পদের প্রাচুর্য ছিল বেশী। ইউরোপীয়রা পৃথিবী জুড়ে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে যখন এই বনজ সম্পদ আহরণের দিকে নজর দেয়, তখন স্বভাবতই এসব অঞ্চলে বসবাসরত স্থানান্তরিক কৃষি-নির্ভর জনগোষ্ঠীদের স্বার্থ তাদের কাছে ছিল গৌণ। বরং স্থানান্তরিক কৃষি ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীদেরকে দেখা হতে থাকে বনজ সম্পদের প্রতি হুমকি হিসাবে। তাই ঔপনিবেশিক শাসকরা সর্বত্রই এই 'আদিম' কৃষিব্যবস্থাকে নির্মূল বা সংকুচিত করার জন্য নানান ব্যবস্থা নিয়েছিল (Tripura and Naher 1994)।[৯] পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। যদিও ব্রিটিশরা আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করে একে তাদের প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় এনেছিল ১৮৬০ সালে, অনেক আগে থেকেই এ অঞ্চলের প্রতি তাদের বাণিজ্যিক দৃষ্টি প্রসারিত ছিল। এখন থেকে দু'শ বছরের বেশী আগে ফ্রান্সিস বুখানন দক্ষিণপূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে মশলাচাষের উপযোগী জায়গা খুঁজতে বেরিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বিভিন্ন জায়গায় জুমচাষ সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য রয়েছে। একটা জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'যেখানে পাহাড় খুব খাড়া, জুমচাষের ... দুটো সুবিধা আছে: কর্ষণের ঝামেলা থাকে না, এবং মাটি অকর্ষিত ও গাছের শেকড় দিয়ে সুরক্ষিত থাকাতে বৃষ্টির পানিতে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।' অবশ্য তাঁর লক্ষ্য যেহেতু ছিল ব্রিটিশদের স্বার্থানুকূল বাণিজ্যিক উদ্যোগের জন্য উপযুক্ত এলাকা চিহ্নিত করা, উদ্ধৃত মন্তব্যের শেষে

তিনি যোগ করেছেন, 'তবে (পরিত্যক্ত) জুমক্ষেতের আকারে ভূমির অপচয় এবং জুমচাষীদের অস্থায়ী পরিস্থিতির সাথে তুলনা করলে এই দুটো সুবিধাই তুচ্ছ মনে হয়। যেখানে পাহাড়গুলো স্বাভাবিক চাষাবাদের জন্য খুব খাড়া, আমার বিশ্বাস সেগুলো চারণভূমি হিসাবে ব্যবহার করাই সবচেয়ে লাভজনক হবে' (van Schendel 1992:97)।[১০] 'স্বাভাবিক চাষাবাদ' (regular cultivation) বলতে বুখানন লাঙল ও সারের ব্যবহার ইত্যাদিকেই বুঝিয়েছেন। উদ্ধৃত মন্তব্যের সাথে, এবং তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আরো বিভিন্ন জায়গায়, তিনি জুমচাষকে কৃষির একটা 'অশীল' (rude) রূপ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করার প্রায় সাথে সাথেই আমরা দেখতে পাই যে প্রশাসনিকভাবে জুমচাষ বন্ধ করার চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম জেলা প্রশাসক ক্যাপ্টেন লুইন চট্টগ্রামের কমিশনারের কাছে জুলাই ১, ১৮৭২ তারিখে লেখা এক চিঠিতে মন্তব্য করছেন, 'জুমচাষ বন্ধ করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো উচিত' (Selections 1887:18)। এই চিঠিতে আপাতদৃষ্টিতে লুইন অবশ্য লাঙলচাষের প্রবর্তনের মাধ্যমে রাজস্ব বাড়ানোর লক্ষ্যেই জুমচাষ বন্ধ করার উপর জোর দিচ্ছিলেন, তবে আমরা জানি যে ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা বড় অংশ জুড়ে সংরক্ষিত বনাঞ্চলও তৈরী করেছিল। অন্যত্র, তাঁর লেখা এক গ্রন্থে, লুইন পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃক্ষসম্পদের উপর এবং এখানে সেগুনচাষের সম্ভাবনার উপর আলোকপাত করেছেন এবং বনাঞ্চল সংরক্ষণের ব্যাপারে একটা উদ্যোগের কথা উল্লেখ করেছেন, যে উদ্যোগের সাথে জেলা প্রশাসক হিসাবে তিনি নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট ছিলেন (Lewin 1869:8)। মজার ব্যাপার হল, একই গ্রন্থে লুইন জুমিয়া জীবনের একটা মনোরম বর্ণনা দিয়ে তার পাশাপাশি সমতল অঞ্চলের একজন কৃষকের জীবনকে নিকৃষ্ট হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন, এবং এও তিনি উল্লেখ করেছেন যে জুমিয়া কৃষকরা নাকি লাঙলচাষ গ্রহণের প্রস্তাব তাচ্ছিল্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করত (ঐ:পৃ.১১)।[১১] সেদিক থেকে পাহাড়ীদের প্রতি স্বঘোষিত সহমর্মিতার অধিকারী এই জেলা প্রশাসক কেন জেনেশুনে তাদের এই কষ্টের জীবনের দিকে ঠেলে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সে প্রশ্নের একটা উত্তর হতে পারে এই যে সাম্রাজ্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার না দিয়ে তার উপায় ছিল না। লুইনসহ তাঁর সমসাময়িক প্রায় সবাই মনে করতেন যে জুমচাষের ফলে বনজ সম্পদের ব্যাপক হানি হয়, কাজেই এই 'ক্ষতি' রোধ করা ছিল তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব। জুমক্ষেতে আগুন লাগানোর বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখছেন, 'আমি নিজে চার দিন চার রাত ধরে একটা পাহাড়ের পুরো একপাশ জ্বলতে দেখেছি। এটা ছিল চমৎকার একটা দৃশ্য, কিন্তু এরকম আগুন নিশ্চয় বনের অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করে' (পৃ.১১)।

লুইনের উত্তরসূরী আর একজন প্রশাসক হাচিনসন অবশ্য জুমচাষের যৌক্তিকতা ও এর বিকল্প সম্পর্কে কিছুটা ভিন্নমত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এমন যে এখানকার চাষাবাদের প্রধান

ধরন হিসাবে জুমচাষ বরাবরই রয়ে যেতে বাধ্য। বিগত বছরগুলোতে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জুমচাষের প্রতি প্রায় ব্যাখ্যাতীত বিরোধিতা ছিল বলে মনে হয়, এবং ক্যাপ্টেন লুইনের মত একজন বিশেষজ্ঞের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখিয়েও আমি বলব যে এই বিরোধিতা এসেছে অনেকাংশে সংশ্লিষ্ট বাস্তবতাসমূহের ব্যাপারে ভুল ধারণা থেকে' (Hutchinson 1906:49)। হাচিনসনের মতে জুমচাষের সাথে জুমিয়াদের কোন ভাবাবেগ-নির্ভর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল না, লাভক্ষতির হিসাব কষে ভাল কোন পন্থা পেলে তারা ঠিকই জুমচাষ ছেড়ে দিত। এক্ষেত্রে জুমচাষের বিকল্প হিসাবে লাঙল চাষের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সমতল জমি পাওয়া যাবে কিনা, এ ব্যাপারে তাঁর সন্দেহ ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃক্ষ সম্পদ আহরণের বিষয়টা তাঁরও বিবেচনায় ছিল, তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্গমতার কারণে তখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার উপায় ছিল না, এমতাবস্থায় তাঁর মতে জুমচাষ বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ হত ওই এলাকার পাহাড়ের সারিগুলোকে পুরোপুরি অব্যবহৃত রেখে দেওয়া। তাঁর অন্য একটা পর্যবক্ষেণও উল্লেখ করার মত: প্রশাসনিক মহলে জুমচাষীদের যাযাবর বলে ভাবা হত, এবং এই ধারণা থেকে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সুবিধার্থে জুমচাষ বন্ধ করে লাঙল চাষের প্রতি জুমচাষীদের আগ্রহী করে তোলার কথা বিবেচিত হত। তাঁর এ বক্তব্যের প্রমাণ মেলে ১৮৭৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক এ, ডব্লিউ, বি, পাওয়ার কর্তৃক চট্টগ্রামের কমিশনারের কাছে লেখা একটা চিঠিতে, যেখানে বলা হয়েছে, 'লাঙল চাষ প্রবর্তনের উদ্যোগ গৃহীত হওয়ার পেছনে মূল লক্ষ্য ছিল পাহাড়ীদেরকে তাদের যাযাবর প্রবৃত্তি (যা হল জুম-পদ্ধতিতে আদিম ধরনের চাষাবাদের প্রত্যক্ষ পরিণাম) থেকে সরিয়ে এনে নির্দিষ্ট আবাসস্থলে স্থায়ী করে তোলা' (Selections 1887:95)।[১২] বাস্তবে জুমচাষীরা দু'এক বছর পর পর চাষজমি পাল্টালেও তাদের গ্রামগুলো যে তুলনামূলকভাবে স্থায়ী ছিল, এ বিষয়টা হাচিনসন ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন (Hutchinson 1906:50-54; cf. Roy 1994)। সবমিলিয়ে অবশ্য জুমচাষের 'যৌক্তিকতা' সম্পর্কে হাচিনসনের মূল্যায়ন ছিল তখনকার বাস্তবতার আলোকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে অচিরেই যে লাঙল চাষের প্রসার ঘটবে, এবং সে সাথে 'পাহাড়ী জীবনের সরলতা'ও যে হারিয়ে যাবে, এ ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না বলে তিনি তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে উল্লেখ করেছেন (পৃ.২০১)।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ব্রিটিশ প্রশাসকদের মধ্যে ব্যক্তিভেদে দৃষ্টিভঙ্গীর কিছু ভিন্নতা থেকে থাকতে পারে, তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সার্বিকভাবে ঔপনিবেশিক নীতিমালা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষ ও জুমচাষীদের চিরতরে প্রান্তিক করে দিয়েছিল, যে প্রান্তিকীকরণ প্রক্রিয়া ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর আরো ত্বরান্বিত হয়।

'উত্তর-ঔপনিবেশিক' কালে ক্ষমতাসীন শ্রেণীর দৃষ্টিতে জুমচাষ

আমার হাতের কাছে যে বাংলা অভিধান রয়েছে, তাতে জুমচাষের বর্ণনা দেওয়া আছে এভাবে, 'জুমিয়া, গারো ইত্যাদি আদিবাসীরা পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বীজ বপন করিয়া যে চাষ করে' (রাজশেখর বসু, প্রণীত চলন্তিকা, ১৩৮০ বাংলা)। একই অভিধানে 'জুমিয়া' শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে এভাবে, 'চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন্য জাতি বিশেষ।' এগুলো এখানে উল্লেখ করছি এই কারণে যে গড়পড়তা শিক্ষিত বাঙালীদের জুমচাষ বা জুমিয়াদের সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও পত্রপত্রিকা ও বিভিন্ন বইপত্রের মাধ্যমে জুমচাষ ও জুমচাষীদের সম্পর্কে কিছু সাধারণ ধারণা অনেকেরই রয়েছে, যা অভিধানের বর্ণনা থেকে হয়তবা খুব ভিন্ন নয়। 'পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে গর্ত খুঁড়ে বীজ বোনা'র বর্ণনাকে পুরোপুরি ভুল বলা যাবে না, তবে এটা খন্ডিত এবং অস্পষ্ট একটা ধারণা দেয় মাত্র। পাশাপাশি জুমচাষী বা জুমিয়াদের 'বন্য' বা 'আদিম' হিসাবে দেখার বিষয়টাও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী খুব বেশী পাল্টেছে, এমন আলামত পাওয়া যায় না।

সাধারণভাবে বলা যায়, 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' কালেও রাষ্ট্রের তথা ক্ষমতাসীন শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে জুমচাষকে বিরূপ দৃষ্টিতেই দেখা হয়েছে, যার বিভিন্ন নজির পাওয়া যায়। আমার জানামতে পার্বত্য চট্টগ্রামে 'জুম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ' নামে বন বিভাগের একটি বিশেষ সংস্থা রয়েছে, এবং সেখানে সরকারী উদ্যোগে 'জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্প' চালু রয়েছে। এধরনের সংস্থা বা প্রকল্পের নামকরণেই জুমচাষ ও জুমচাষীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় নীতিমালা সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। খাগড়াছড়ি অঞ্চলে আশির দশকে একসময় সামরিক কর্তৃপক্ষ জুমচাষ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।[১৩] কিন্তু এ নিয়ে তেমন কোন প্রতিবাদ বা সমালোচনা হয় নি, কারণ পুরো দেশের প্রেক্ষিতেতো বটেই, খোদ পাহাড়ীদের মধ্যেও জুমচাষীরা ততদিনে একটা প্রান্তিক শ্রেণীতে পর্যবসিত হয়েছে। তাছাড়া, সেসময় গণহত্যার মত ঘটনাও দেশীয় সংবাদমাধ্যমগুলোতে ঠিকভাবে প্রচারিত হয়নি, কাজেই জুমচাষ বন্ধের বিষয়টি তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে বিশেষ কারো নজর কাড়ে নি। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী মহলেও জুমচাষকে 'আদিম' ও 'ধ্বংসাত্মক' হিসাবে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, এই প্রেক্ষিতে জুমচাষ বন্ধের কোন উদ্যোগের বিরুদ্ধে কলম ধরার তাগিদ কমজনই হয়ত বোধ করবেন। জুমচাষ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার ব্যাপকতার অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, এই প্রবন্ধ লিখতে বসার পর দৈনিক *ভোরের কাগজ*-এর এপ্রিল ৩, ২০০০ সংখ্যায় কবি-সাংবাদিক ওমর কায়সারের একটি ফিচার আমার চোখে পড়ে, যার শিরোনাম ছিল, 'পাহাড়ে পাহাড়ে জুম, বিরান কান্তার।' লেখক তাঁর আলোচনায় বনবিনাশের জন্য একাধিক কারণ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু শিরোনামই বলে দিচ্ছে জুমচাষকেই প্রধানত দায়ী করা হচ্ছে। একইভাবে *যায় যায় দিন* সাপ্তাহিকীর ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯৭-এ প্রকাশিত সংখ্যায় শফিক রেহমানের 'দিনের পর দিন' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনায়

বনবিনাশের কারণ হিসাবে জুমচাষকে দায়ী করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এসব ক্ষেত্রে কোন তথ্য-প্রমাণ ও বিশ্লেষণ ছাড়াই একটা প্রচলিত ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসাবে প্রচার করা হয়। ১৯৯৬ সালের ১০ই নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্রে আমি আমার তখনকার পিএইচডি গবেষণার উপর একটা সেমিনার দিয়েছিলাম, সেখানে জুমচাষ প্রসঙ্গে নৃবিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক মন্তব্য করেছিলেন, 'কিন্তু জুমচাষতো আদিম!'

শুধু বাংলাদেশে নয়, পাশের দেশ ভারতেও জুমচাষ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা রাষ্ট্রীয়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় সরকারীভাবে জুমচাষীদের 'উন্নততর' কৃষিব্যবস্থায় উত্তীর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ১৯৫৫ সালের একটি সরকারী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে: 'এই স্থানান্তরিক কৃষি পদ্ধতি ... মারাত্মকভাবে সমালোচিত হয়েছে অনেকক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিক্ষয়, বনবিনাশ ... (প্রভৃতি)-র জন্য সরাসরি দায়ী বলে। বনভূমিসমূহের প্রভূত জাতীয় গুরুত্ব, ভূমি সংরক্ষণ ও উপজাতীয়দের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে স্থানান্তরিক কৃষি-নির্ভর পার্বত্য জনগোষ্ঠীদের স্থায়ী কৃষক হিসাবে পুনর্বাসিত করা জরুরী' (Ganguly 1968:70-এ উদ্ধৃত)। এধরনে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার আলোকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জুমচাষ বন্ধ করে জুমচাষীদের 'পুনর্বাসিত' করার বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চাশের দশকে ত্রিপুরায় এ ধরনের উদ্যোগ শুরু করা হয়। একইভাবে নাগাল্যান্ডের প্রেক্ষিতে একটি সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায়, জুমচাষ 'অপচয়কর' (wasteful) হওয়াতে রাজ্য কৃষি বিভাগ নাগাল্যান্ডে ধাপ-কৃষি (terrace farming) চালু করার উদ্যোগ নেয় (Devlopment Commissioner 1967:18)। দেখা যাচ্ছে, জুমচাষ যে 'আদিম', 'বনভূমির জন্য ক্ষতিকর', ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত এই বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' আমলেও বহাল রয়েছে। সহজেই অনুমেয়, পৃথিবীর অন্যান্য 'উত্তর-ঔপনিবেশিক' রাষ্ট্রগুলোতেও স্থানান্তরিক কৃষির প্রতি ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় অভিন্নই রয়ে গেছে।

জুমচাষ সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল্যায়ন

জুমচাষকে যে ঢালাওভাবে 'আদিম' বা 'ক্ষতিকর' হিসাবে দেখা যায় না, এ বক্তব্য উপরের আলোচনায় প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বনভূমির উপর জুমচাষের ক্ষতিকর প্রভাব আছে বলে যারা মনে করেন, তাদের এ ধারণা অনেকাংশেই অনুমাননির্ভর, যার পেছনে কোন বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ-বিশ্লেষণ নেই। সেদিক থেকে জুমচাষ কখন কতটা কোন্ অর্থে ক্ষতিকর, এ বিষয়টা স্পষ্ট করার দায়ভার এই ধারণা যারা পোষণ করে, তাদের উপরই বর্তায়। কিন্তু জুমচাষীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক প্রান্তিকতার সুবাদে এই দায় সহজেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। যাহোক, বনভূমির উপর জুমচাষের ক্ষতিকর প্রভাব সংক্রান্ত ধারণার যথার্থতা বিচার করতে গেলে একটা

বিষয় বিবেচনায় নেওয়াই যথেষ্ট হতে পারে, তা হল, এই কৃষি-পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে বনভূমির অস্তিত্বের উপর, কাজেই বনভুমির ব্যাপক ক্ষতি হলে জুমচাষীদেরই ক্ষতি। সেদিক থেকে বহু প্রজন্মের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটা ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিকভাবেই কিছু রক্ষাকবচ গড়ে উঠবে, এটা আশা করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সনাতনী পদ্ধতির জুমচাষের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যেটুকু তথ্য আমার জানা আছে, তা নিশ্চিতভাবে এরকমই ইঙ্গিত দেয়। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুমচাষীরা সচরাচর একটা বিশেষ প্রজাতির বাঁশ ঝাড়ে পরিপূর্ণ এলাকায় জমি নির্বাচন করতে পছন্দ করত বলে জানা যায়।[১৪] এক্ষেত্রে জঙ্গল কাটার সময় বাঁশের গোড়াগুলো রেখে দেওয়া হয়, যেগুলো থেকে পরবর্তীতে বাঁশঝাড় সহজেই আবার ফিরে আসে। কড়ই গাছের মত বড় গাছ সচরাচর কাটা হয় না, কারণ জুমচাষীরা জানে যে কড়ই গাছের ফল নীচে যেখানে মাটিতে পড়ে, সেখানে ফলন খুবই ভাল হয়। এছাড়া প্রয়োজনে মাটির ক্ষয় রোধ করার জন্যও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয় (বলা বাহুল্য, জঙ্গল পুড়িয়ে ছাইয়ের আকারে যে সার জমিতে দেওয়া হয়, মাটির উপরের স্তর বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলে তার কোন সুফল মিলবে না)। সচরাচর একই জমিতে বিভিন্ন ফসল ফলানো হয়, যেগুলোর মধ্যে নানান জাতের ধান, ভূট্টা, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজী, তূলা, তিল প্রভৃতি রয়েছে। খাগড়াছড়ি অঞ্চলের জুমচাষীদের মধ্যে কমপক্ষে ১৫-২০ (এবং অন্যত্র আরো বেশী) জাতের ধানের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। মাটির ধরন ও অন্যান্য প্রয়োজন অনুসারে একই জমির বিভিন্ন অংশে একাধিক জাতের ধান ফলানো হতে পারে।[১৫] এসব তথ্য নিঃসন্দেহে এই ইঙ্গিত দেয় যে, স্থানিক পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখেই জুমচাষের সনাতনী পদ্ধতিগুলো গড়ে উঠেছিল। এছাড়া জুমিয়া কৃষকরা অনেক সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধও মেনে চলত, যেগুলো বনভূমির নির্বিচার বিনাশের বদলে পরিবেশ-রক্ষার পক্ষেই কাজ করত (উদাহরণস্বরূপ, বাদুড়ের গুহা আছে, এরকম কোন পাহাড়ে ত্রিপুরা জুমিয়া কৃষকরা আবাদ করত না [১৬])। অথচ জুমচাষের এই বিবিধ দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছাড়াই বহিরাগত সরকারী কর্মকর্তারা (এমনকি যারা কোনদিন স্বচক্ষে জুমক্ষেত দেখে নি, তারাও) এই কৃষি-পদ্ধতিকে 'আদিম' ও 'ক্ষতিকর' হিসাবে চিহ্নিত করে এটিকে নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করার উদ্যোগ নিয়েছে।

অপরিচিত ভিন্ন কিছুকে নিজ সংস্কৃতির নিরিখে বোধগম্য করতে না পারার প্রবণতা জুমচাষ সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর একটা ভিত্তি হতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো যেসব জায়গায় জুমচাষ হয় সেসব জায়গায় দেখা যায়, আশেপাশে বন জঙ্গল, মাঝে অল্প জায়গা জুড়ে পাহাড়ের ঢালে জুমক্ষেত। অনেকের কাছে এরকম দৃশ্যের নান্দনিক আবেদন থাকতে পারে, তবে একজন পর্যটক যদি জঙ্গল কাটার পর জুমক্ষেতে আগুন লাগানোর মুহূর্তে উপস্থিত থাকে, তাহলে ওইটুকু জায়গা পুড়তে দেখেই তার মনে প্রথম যে ভাবনাটা জাগতে পারে, তা সম্ভবত এরকম: 'এরাতো পুরো বনাঞ্চলই কেটে পুড়িয়ে সাবাড় করে ফেলছে!' (জুমক্ষেতে আগুন লাগানোর সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে পূর্বে

উদ্ধৃত লুইনের ভাবনা সম্ভবতঃ এই ধরনেরই একটা প্রতিক্রিয়া ছিল।) সমতল অঞ্চলে মাইলের পর মাইল ফসলের ক্ষেত দেখে সচরাচর কেউ আক্ষেপ করে না যে বনাঞ্চল উজাড় হয়ে গেল, কারণ এসব ক্ষেত্রে ওই বিস্তীর্ণ এলাকায় যে একসময় বনভূমি বা অন্য কিছু ছিল, সে চিন্তাই হয়ত কারো মাথায় আসে না। জুমচাষের আওতাধীন এলাকাগুলোর ক্ষেত্রে পার্থক্য হল এই যে, সেখানে আবাদকৃত জমির তুলনায় বনজঙ্গলের পরিমাণ বেশী থাকে, ফলে এটা এক ধরনের পরিহাস হয়ে দাঁড়ায় যখন বনভূমিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবয়ব দেওয়ার কাজে ঐতিহাসিকভাবে অধিকতর দক্ষতা দেখানো সমাজের প্রতিনিধিরা এসে বলে, এসব বনাঞ্চল রক্ষা করতে হবে।

তবে সার্বিকভাবে জুমচাষ ও জুমচাষীদের সম্পর্কে ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টিভঙ্গী মূল্যায়ন করলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এটি মূলতঃ জুমচাষের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী ও তাদের এলাকার উপর ঔপনিবেশিক শাসন আরোপকে মতাদর্শিক বৈধতা দেওয়ার অংশ হিসাবেই কাজ করেছে। এদিক থেকে 'ঔপনিবেশিকতা'র ধারণা শুধু ব্রিটিশদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সাধারণভাবে বলা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রতি পাকিস্তানী ও পরবর্তীতে বাংলাদেশী রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতিমালায়ও ঔপনিবেশিকতার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রয়ে গেছে। এই 'আভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতা'[১৭] অন্ততঃ তিনটা আন্তঃসম্পর্কিত ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল রয়েছে বলে যুক্তি দেখানো যায়, এক: ব্রিটিশ শাসকদের ধ্যান ধারণা দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি পরবর্তীকালের ক্ষমতাসীন শ্রেণীর মধ্যেও বহুলাংশে বিদ্যমান রয়ে গেছে; দুই: পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদকে 'জাতীয় উন্নয়নের' স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বার্থ বিবেচনায় না নিয়ে (যেমন, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করার মাধ্যমে); তিন: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত জন-স্থানান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (সত্তরের দশকের শেষ ও আশির দশকের শুরুর বছরগুলোতে) ব্যাপকহারে বাঙালী বসতি গড়ে তোলা হয়েছে। উল্লিখিত বিভিন্ন রূপে ক্রিয়াশীল আভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতার একটা অনুষঙ্গ হিসাবে জুমচাষ ও জুমচাষীদের সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীকে মূল্যায়ন করা যায়।

বৃহত্তর প্রেক্ষিতে দেখলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে বা 'শিক্ষিত' মহলে জুমচাষ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা থাকাটা একটা বৈশ্বিক প্রবণতারই অংশ হিসাবে দেখতে হবে, যে প্রবণতার চূড়ান্ত উৎস নিহিত রয়েছে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার ইতিহাসে, এবং আধুনিকায়নের ডিসকোর্সে। এ প্রসঙ্গে দৈনিক ভোরের কাগজের এপ্রিল ২৬, ২০০০ সংখ্যায় প্রকাশিত পিআইবিতে কর্মরত শামীমা চৌধুরীর 'পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসছে পার্বত্য জনগোষ্ঠী' শীর্ষক একটি 'অভিমত-কলামে' দেওয়া কিছু তথ্য তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, 'সম্প্রতি খাগড়াছড়িতে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সহায়তায় টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির (সেমপ)

উদ্যোগে পরিবেশ একশন প্লানের তৃণমূল পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল খাগড়াছড়িতে।' এই প্রতিবেদন থেকে মনে হয়, উক্ত কর্মশালায় জুমচাষকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধরে নিয়েই এর 'বিকল্প' খোঁজা হয়েছে এবং এদিক থেকে জাতিসংঘ থেকে আঞ্চলিক পরিষদ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে জুমচাষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর অভিন্নতা রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে জুমচাষের প্রতি আঞ্চলিক পরিষদের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হওয়ার কথা, যেহেতু এর কর্তৃত্ব রয়েছে জনসংহতি সমিতির হাতে, যে সংগঠন 'জুম্ম'দের স্বার্থ রক্ষার কথা বলে (স্মর্তব্য যে, 'জুম্ম' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল 'জুমিয়া')। তবে 'জুম্ম' জাতীয়তার ধারণা যে একটি আধুনিকতাবাদী নির্মাণ (Tripura and Ahmed 1994:51-52; ভান সেন্দেল ১৯৯৮), তা জানা থাকলে এই ভিন্নতা প্রত্যাশা করা যায় না। বরং বাস্তবে জনসংহতি সমিতি জুমচাষকে নিরুৎসাহিত করে এসেছে বলে যে তথ্য জানা যায় (Mohsin 1997:119), তার আলোকে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী বা বিভিন্ন সরকারী সংস্থার পাশাপাশি আঞ্চলিক পরিষদও যে জুমচাষের 'বিকল্প' অনুসন্ধান করার মাধ্যমে 'পরিবেশ সহায়ক উন্নয়ন কার্যক্রম' গ্রহণে উদ্যোগী হবে, এটা অপ্রত্যাশিত কোন বিষয় নয়।

আমি ১৯৯৩ সালে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম, 'সরকারী পরিকল্পনা বিশারদ বা অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে রবার চাষ জুম ব্যবস্থার বিকল্প মনে হতে পারে, কিন্তু একজন জুমিয়া কৃষক জানে যে সে রবার খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, এবং রবার চাষ করে সে যে তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য পাবে, এমন কোন নিশ্চয়তা সে দেখে না। ব্রিটিশ শাসনামলে বাঙালী কৃষকদের কাছে নীল চাষ যা ছিল, জুমিয়া কৃষকদের কাছে রবার চাষও ঠিক তাই' (ত্রিপুরা ১৯৯৩)। পরে আমি জানতে পারি যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের রবার চাষ প্রকল্পে কর্মরত এক পাহাড়ী কর্মকর্তা আমার এই বক্তব্য নাকচ করে দিয়েছিলেন। তাঁর সাথে আমার কখনো সরাসরি সাক্ষাত হয় নি, কাজেই যুক্তি আর প্রমাণ দিয়ে পরস্পরের অবস্থান যাচাই করার সুযোগ ঘটে নি। এখানে এ তথ্যটি উল্লেখ করছি এটাই বোঝাতে যে জুমচাষ বন্ধের উদ্যোগের সাথে এখন পাহাড়ীদেরও অনেকে বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে। একশতাধিক বছর আগে ব্রিটিশ প্রশাসকেরা জুমচাষ বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েও তেমন সফল হয় নি, তবে আজ পাহাড়ী বা জুম্মদের মধ্যেই যে অনেকে এই দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে, তা এটাই প্রমাণ করে যে 'আধুনিকায়ন' ও 'উন্নয়ন' বিষয়ক ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া ধ্যান ধারণা দৃষ্টিভঙ্গী এখন তাদের মধ্যেও বিস্তৃত হয়েছে।

জুমিয়া বনাম জুম্ম

স্পষ্টতই, পাহাড়ীদের মধ্যে একটা প্রভাবশালী নূতন শ্রেণী গড়ে উঠেছে যারা জুমিয়া জীবনকে পেছনে ফেলে এসেছে। এই শ্রেণীর আবির্ভাবের প্রক্রিয়া এখানে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, পার্বত্য চট্ট

গ্রামে ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে সেখানকার আদিবাসীরা প্রায় সবাই জুমচাষী ছিল, কিন্তু গত একশতাধিক বছরের ব্যবধানে তাদের একটা বিরাট অংশই লাঙলচাষের উপর নির্ভর করতে শুরু করেছে (Sopher 1964)। অথচ এ অঞ্চলে লাঙল চাষের উপযোগী জমির পরিমাণ বেশী ছিল না, এবং যেটুকু ছিল তার উপরও ক্রমবর্ধমান হারে বাঙালী কৃষকদের চাপ পড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন চালু হওয়ার পূর্বে এখানে বাঙালী বসতি প্রায় ছিলই না। কিন্তু 'কুকী'দের ভয় কেটে যাওয়ার পর বাঙালী কৃষকদের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকাঞ্চলগুলোতে গিয়ে চাষাবাদ করার অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে। ঠিক এই সময়েই 'পাহাড়ী'দের মধ্যেও জুমচাষ ছেড়ে লাঙল চাষ ধরার প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমদিকে ব্রিটিশ প্রশাসকরা জুমচাষীদের লাঙল চাষে উৎসাহী করতে চেয়েও বিশেষ সাড়া পায়নি, কিন্তু সংরক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষের উপযোগী জায়গার পরিমাণ কমে যাওয়াতে জুমচাষীরা ধীরে ধীরে লাঙল চাষ ধরতে থাকে। ব্রিটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালী কৃষকদের অভিবাসনের উপর বিধিনিষেধ চালু হওয়ার ফলে উপত্যকাঞ্চলগুলো নিয়ে বাঙালী ও পাহাড়ীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন পরিবেশ আর রইল না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকার এমন দুটি পদক্ষেপ নেয় যেগুলো পাহাড়ীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ছড়িয়ে দেয়। এ পদক্ষেপগুলো ছিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা তুলে দেওয়া এবং কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ। ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ প্রশাসনিক মর্যাদা তুলে দেওয়ার ফলে সমতল অঞ্চলের মানুষদের পক্ষে এ জেলায় অভিবাসিত হতে আর কোন বাধা রইল না। ইতোমধ্যে পাহাড়ীদের মধ্যে লাঙল চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে অভিবাসী বাঙালী কৃষকদের সাথে তাদের স্বার্থের সংঘাত সূচিত হয়েছিল। কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে এ সংঘাত আরও অনিবার্য হয়ে ওঠে, কারণ এতে জেলার মোট চাষযোগ্য সমতল জমির প্রায় চল্লিশ শতাংশ জলমগ্ন হয়। কাপ্তাই বাঁধের ফলে প্রায় এক লক্ষের মত মানুষ স্থানচ্যুত হয় (অধিকাংশ চাকমা সম্প্রদায়ের), যারা যথাযথভাবে পুনর্বাসিত হয় নি। অনেক পর্যবেক্ষকই মনে করেন যে, কাপ্তাই বাঁধের ফলে স্থানচ্যুতি এবং বাঙালীদের অভিবাসন বিকাশমান পাহাড়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সঞ্চার ঘটিয়েছিল, তাই ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমকালীন এথনিক বোধ ও রাজনৈতিক চেতনার মূল উৎস (Dewan 1990:441; Bertocci 1984:354)। 'জুম্ম' আত্মপরিচয় নির্মিত হয়েছে এই প্রেক্ষাপটেই।

'জুম্ম' হিসাবে আখ্যায়িত সবাই যেহেতু বাস্তবে জুমচাষ করে না, 'জুম্ম জাতীয়তাবাদী'দের সাথে সমকালীন 'জুমিয়া কৃষক'দের সম্পর্ক কি, তা পরীক্ষা করে দেখার বিষয়। এ প্রসঙ্গে 'জুম্ম' পরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়াটা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ব্যুৎপত্তিগতভাবে চাকমা ভাষার 'জুম্ম' শব্দটা বাংলা 'জুমিয়া' শব্দের সাথে সম্পর্কিত বটে (দুটোই এসেছে 'জুম' থেকে), কিন্তু দুটোর

দ্যোতনা ভিন্ন। সত্তর দশক নাগাদ যখন চাকমাদের অনেকে 'পাহাড়ী' বা 'উপজাতীয়' পরিচয়ের বিকল্প হিসাবে 'জুম্ম' শব্দটা ব্যবহার করতে শুরু করে তখন আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেককে এটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি প্রকাশ করতে শুনেছি, এই যুক্তিতে যে এটি চট্টগ্রামী বাংলার অবজ্ঞাসূচক 'জুম্মুয়া'কে মনে করিয়ে দেয় (চট্টগ্রামী বাংলায় 'জুম্মুয়া-খাপ্পুয়া' কথাটা 'অসভ্য, অমার্জিত' অর্থে পাহাড়ীদের উপর প্রয়োগ করা হত, অনেকটা মার্কীন ইংরেজীতে hill-billy শব্দ যে ধরনের অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয় সেভাবে)। এদিক থেকে 'জুম্ম' পরিচয়ের প্রবক্তাদের কৃতিত্ব এই যে শব্দটিকে তারা একটা ইতিবাচক ব্যঞ্জনা দিতে পেরেছে।[১৮] এটি সম্ভব হওয়ার পেছনে শুধুমাত্র জনসংহতি সমিতির প্রচারণাই কাজ করে নি, সে সাথে 'জুম্ম' সত্তার একটা 'রোমান্টিক' প্রতিরূপ গড়ে তোলার প্রক্রিয়াও ক্রিয়াশীল ছিল। পাহাড়ী শিক্ষিত মধ্যবিত শ্রেণী, যা চাকমাদের মধ্যে বিকশিত হয়েছে সবচেয়ে বেশী, তাদের 'ঐতিহ্যে'র অন্বেষায় হারিয়ে যাওয়া জুমিয়া জীবনকে নূতন রূপে তুলে এনেছে গানে, কবিতায়, শিল্পকর্মে। নমুনা হিসাবে এখানে দুটি চাকমা গানের কিছু চরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে: ১. হোই হোই হোই ... জুমত যেবং/জুমত যেইনেই গইচ্যা সুদা তুলিবং/গইচ্যা সুদা বেজিনেই টেঙা কামেবং। বাংলা: 'ওহে (আমরা সবাই মিলে) জুমক্ষেতে যাব/জুমক্ষেতে গিয়ে কার্পাস তুলব/কার্পাস বেচে টাকা কামাব।' ২. জুম্মবি, কমলে হাদিবে ম' ধাগত ...। বাংলা: জুম্মবি ('পাহাড়ী মেয়ে'র জন্য রোমান্টিক সম্বোধন), তুমি কখন আমার পাশে হাঁটবে ...।[১৯] উল্লেখ্য, উভয় গানই আধুনিক কালে রচিত। এ ধরনের গানের রচয়িতাদের কেউ নিজেরা জুমচাষ করে না, কাজেই এসব গানের কথাগুলোকে জুমিয়া জীবনের অভিব্যক্তি হিসাবে দেখা যায় না। এগুলো গাওয়া হয় মঞ্চে, বাজানো হয় ক্যাসেটে, রেডিওতে, অনেক সময় গীটার, সিনথেসাইজার প্রভৃতি সহযোগে। একইভাবে 'জুম নৃত্য' নামক কোন উদ্ভাবন যখন 'ঐতিহ্যবাহী চাকমা নাচ' হিসাবে শহুরে দর্শকদের সামনে পরিবেশন করা হয়, বা কোন পাহাড়ী শিল্পীর আঁকা 'জুমিয়া জীবনের ছবি' যখন ঢাকার আর্ট গ্যালারিতে বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়, তখন সেগুলোকে দেখতে হবে শহুরে মধ্যবিত্ত পাহাড়ীদের 'উদ্ভাবিত ঐতিহ্যে'র উপাদান হিসাবে (Hobsbawm and Ranger 1983)। 'জুম্ম' জাতীয়তার ধারণাকে এই ঐতিহ্য উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ারই একটা রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

বাস্তবে জুমিয়া কৃষক শ্রেণী আর উল্লিখিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাহাড়ীদের মধ্যে তৈরী হয়ে গেছে বিস্তর ব্যবধান। এই ব্যবধানের দুটো প্রধান দিক রয়েছে। প্রথমত, কোন কোন এথনিক গোষ্ঠীর জন্য বর্তমানে জুমচাষের বিশেষ কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব নেই। (যেমন, খাগড়াছড়ি জেলায় চাকমা ও মারমাদের মধ্যে জুমচাষীদের সংখ্যা অতি নগণ্য, পক্ষান্তরে ত্রিপুরাদের মধ্যে এ সংখ্যা আনুপাতিক হারে বেশী। অন্য দুই জেলায়ও জাতিভেদে এ ধরনের ভিন্নতা রয়েছে।) দ্বিতীয়ত, প্রতিটা এথনিক গোষ্ঠীর মধ্যে জুমিয়া কৃষকরা ক্রমশঃ প্রান্তিক শ্রেণীতে

পর্যবসিত হয়েছে। (উদাহরণস্বরূপ, উপত্যকাবাসী ত্রিপুরারা তাদের জুমিয়া জ্ঞাতিদের কিছুটা অবজ্ঞার সাথে 'পারনি বরক' বা 'পাহাড়ের ত্রিপুরা' বলে চিহ্নিত করে)। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, চাকমাদের মধ্যেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে সবচেয়ে বেশী, যে শ্রেণী 'জুম্ম' জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে। ফলে জনসংহতি সমিতি যে জুমচাষ ছাড়ার জন্য পাহাড়ীদের উৎসাহিত করত, তা কোন অপ্রত্যাশিত বিষয় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে একসময় শান্তিবাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকাসমূহে জুমচাষ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেছিল বলে জানা যায়, যার পেছনে কথিত লক্ষ্য ছিল 'যাযাবর' হিসাবে পাহাড়ীদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ঘোচানো এবং তাদের ভূমির অধিকার অর্জনের পথ দেখানো (Mohsin 1997:119-120)।[২০] শান্তিবাহিনী যে কারণেই জুমচাষ বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়ে থাকুক না কেন, জুমিয়া কৃষকরা এ উদ্যোগকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই। বরং এক পর্যায়ে কেন চাকমা বাদে অন্যান্য এথনিক গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিবাহিনীর প্রতি জনসমর্থন যথেষ্ট কমে গিয়েছিল, তার একটা প্রধান কারণ হয়তবা ছিল জুমচাষ নিষিদ্ধ করার মত পদক্ষেপ। উল্লেখ্য যে, শান্তিবাহিনী তথা জনসংহতি সমিতিতে মূলতঃ চাকমাদেরই প্রাধান্য ছিল, যাদের অধিকাংশই জুমচাষ ছেড়ে দিয়েছে বেশ আগেই। পক্ষান্তরে, অন্যান্য এথনিক গোষ্ঠীসমূহের অনেকগুলোর ক্ষেত্রেই তুলনামূলকভাবে জুমচাষের উপর অধিকতর নির্ভরশীলতা দেখা যায়। এসমস্ত বিষয় বিবেচনায় নিলে এ সিদ্ধান্ত টানা অযৌক্তিক হবে না যে প্রকৃত জুমিয়ারা রয়ে গেছে 'জুম্ম' জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলস্রোত থেকে সবচেয়ে দূরে।

উপসংহারঃ জুমচাষ ও জুমিয়াদের ভবিষ্যৎ

এই নিবন্ধে আমরা দেখেছি যে, ব্রিটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুমচাষ বন্ধ করার যে প্রক্রিয়া সূচিত হয়েছিল, তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, পাহাড়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী জুমিয়া জীবনের একটা রোমান্টিক প্রতিরূপ সাংস্কৃতিকভাবে পুর্ননির্মাণ করেছে, কিন্তু বাস্তবে তারা জুমচাষ তথা সমকালীন জুমিয়াদের থেকে ক্রমশঃ দূরে চলে এসেছে। অন্যদিকে পাহাড়ীদের যে ক্ষীয়মান অংশ এখনো জুমচাষের উপর নির্ভরশীল, ক্রমবর্ধমান প্রশাসনিক, মতাদর্শিক, প্রতিবেশগত প্রভৃতি নানান চাপের মুখে তাদের ভবিষ্যৎ রয়েছে অনিশ্চয়তার মুখে। কি হতে পারে সমকালীন জুমিয়াদের ভবিষ্যৎ? এ প্রশ্নের কিছু সম্ভাব্য উত্তর আমাদের এখনই জানা আছে। এ নিবন্ধে পাহাড়ীদের মধ্য থেকে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে, তবে যে বিষয়টা উহ্য রয়ে গেছে তা হল, সবার বেলায় এই শ্রেণীতে জায়গা হয় নি। পাহাড়ীদের মধ্যে যারা বিভিন্ন কারণে জুমচাষ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু লাঙল চাষের উপযোগী জমির অধিকারী হতে পারে নি বা শিক্ষার সুযোগ পায় নি, তাদের অনেকেরই জীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে লাকড়ি, শন, কাঠ-কয়লা প্রভৃতি বিক্রি করা, বা স্রেফ দিনমজুর হিসাবে কাজ করা। যারা এখনো জুমচাষ ছাড়ে নি, তাদের

কাছে এই বিকল্পগুলোর কোনটাই হয়তবা আকর্ষণীয় নয়। তবে জুমচাষকে আদিম ও ক্ষতিকর হিসাবে দেখার প্রবণতা না কমলে অচিরেই বাদবাকী জুমচাষীরাও ভূমির উপর তাদের প্রথাগত অধিকার হারিয়ে নিঃস্বতর অবস্থানে চলে যাবে, এটা মোটামুটি নিশ্চিত। তখনো হয়ত জুমিয়াদের উপস্থিতি থাকবে-- নূতন প্রজন্মের শহুরে মধ্যবিত্ত জুম্মদের গানে, কবিতায়, চিত্রকর্মে, বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায়। তবে সমকালীন জুমিয়ারা নিজেরা কি ধরনের অভিযোজনশীলতা ও ইতিহাস বোধ লালন করছে, তার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করবে তাদের ভবিষ্যৎ।

টীকা

১ এথনিসিটি ও এথনিক গ্রুপের সাধারণভাবে প্রচলিত কোন বাংলা প্রতিশব্দ এই লেখকের জানা নেই। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে জাতি, গোষ্ঠী, উপজাতি বিভিন্ন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এখানে বিভ্রান্তি এড়ানোর লক্ষ্যে আমি এথনিসিটি ও এথনিক গ্রুপের বাংলা করেছি যথাক্রমে 'এথনিকতা' ও 'এথনিক গোষ্ঠী'।

২ শব্দটি ইংরেজী বানানে লেখা হয় , যা অনেক প্রকাশনায় বাংলায় 'জুম্মা' হিসাবে লেখা হয়েছে (যেমন, ভান সেন্দেল ১৯৯৮)। তবে জনসংহতি সমিতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি সংগঠনের প্রকাশনায় 'জুম্ম' বানানই দেখা যায়, যা এখানে অনুসৃত হয়েছে।

৩ ব্রিটিশরা কিভাবে এই 'হিল মেন' বা 'পাহাড়ী' পরিচয়ের ঐতিহাসিক ভিত্তি তৈরী করে দিয়েছিল, তা আমি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি (Tripura 1992, ও এর বাংলা ভাষ্য, প্রশান্ত ত্রিপুরা ১৯৯৮ দ্রঃ)।

৪ সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি.ফিল শিক্ষার্থী হিসাবে আমার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল Ecology, Ethnicity and Colonialism in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. গবেষণার অংশ হিসাবে Social Science Research Council-এর দেওয়া একটি অনুদানের সহায়তায় আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৯৬/৯৭-এ প্রায় একবছর মাঠকর্মে নিয়োজিত ছিলাম।

৫ গিয়ার্টজের তুলনা নিয়ে দু'দশক পরের নৃবিজ্ঞানীদের অনেকে প্রশ্ন তুলেছিলেন ১৯৮০ সালে American Anthropological Association আয়োজিত 'Does the Swidden Ape the Jungle?' শীর্ষক এক সিম্পোজিয়ামে। এতে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশ প্রকাশিত হয়েছে Human Ecology Vol. 11, No. 1-এ (Beckerman 1983)।

৬ জুমক্ষেতে এক ফসলের চাষ এবং রাসায়নিক কীটনাশক ও সারের ব্যবহার পার্বত্য চট্টগ্রামেও লক্ষ্য করা গেছে। বান্দরবানের রুমা অঞ্চলে গিয়ে আমি জানতে পেরেছিলাম সেখানকার জুমচাষীদের অনেকে একই জমিতে শুধু আদার চাষ করার প্রতি মনোযোগী ছিল, কারণ আদার বাজারদর ছিল ভাল এবং জমিতে ফলন খারাপ হত না। তবে সাময়িকভাবে 'লাভজনক' হলেও এধরনের বাজারমুখী জুমচাষ অন্ততঃ প্রতিবেশগত বিবেচনায় সনাতনী পদ্ধতির চাইতে কম উপযোগী বলেই মনে হয়।

৭ লুইনের এই বিভাজন পরবর্তীকালের গবেষকদের কাজেও লক্ষ্য করা যায়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে লুইন যাদেরকে 'পর্বতবাসী' বর্গে ফেলেছিলেন, অন্যরা তাদেরকে 'নদীতীরবাসী' বা 'উপত্যকাবাসী' বর্গে অন্তর্ভুক্ত করেছেন (দেখুন, Sopher 1964; Jahangir 1984:290; মে ১৯৯৬; ইত্যাদি)।

৮ লুইনের ব্যবহৃত ইংরেজী বানান সরাসরি 'জুমিয়া' শব্দকে নির্দেশ করে, না চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলায় প্রচলিত 'জুম্মা/জুম্মুয়া'কে, এটা স্পষ্ট না। বুখাননের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে মারমাদের বাঙালীরা 'জুমিয়া মগ' বলত।

৯ সম্প্রতি একজন ইতিহাসবিদ দক্ষিণ ভারতের প্রেক্ষিতে স্থানান্তরিক কৃষির প্রতি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা বিস্তারিত বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন (Pouchepadass 1998)।

১০ এ নিবন্ধে ইংরেজী গ্রন্থাবলী থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিসমূহ মূল ইংরেজী ভাষ্যে না দিয়ে এই লেখকের নিজস্ব অনুবাদ অনুযায়ী বাংলায় দেওয়া হয়েছে। বুখাননের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে, তবে উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ পুরোপুরি মূলানুগ মনে হয় নি আমার কাছে (দেখুন, ভান সেন্দেল ১৯৯৪:পৃ.১২১)।

১১ জুমচাষীদের মধ্যে লাঙলচাষের প্রতি যে একটা বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, তা আমারও মনে হয়েছে নিজের সংগৃহীত কিছু তথ্য থেকে। যেমন, প্রথম দিকে ত্রিপুরাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় যেসব পরিবার জুমচাষ ছেড়ে যারা লাঙল ধরেছিল, তাদের নাকি অন্যরা এই বলে উপহাস করত যে তাদের গা থেকে কাদার গন্ধ পাওয়া যায়। অবশ্য এই তথ্য থেকে সরাসরি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে এধরনের সাংস্কৃতিক বিরূপতার কোন 'বস্তুগত' ভিত্তি নেই।

১২ মূল ইংরেজী ভাষ্যে বলা হয়েছে, "The original object of the plough cultivation scheme was to wean the hill men from their migratory habits ..." (Selections 1887:95). এখানে wean শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়, যা পাহাড়ীদের আদিম, সরল বা শিশুসুলভ হিসাবে দেখার প্রবণতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

১৩ এটি কোন আনুষ্ঠানিক সরকারী সিদ্ধান্ত ছিল কিনা, এবং তা জেলার সর্বত্র প্রযোজ্য ছিল কিনা, তা অবশ্য অনুসন্ধানসাপেক্ষ বিষয়। লোফলারের একটি রিপোর্ট (Loeffler, n.d.:5) থেকে জানা যায় যে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায় ১৯৮৮ সাল থেকে জুমচাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবে তাঁকে নাকি বলা হয়েছিল যে এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেওয়া হত না, তাদেরকে 'নিরুৎসাহিত' করা হত মাত্র।

১৪ এ অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত তথ্য আমি সংগ্রহ করেছিলাম খাগড়াছড়ির তৈবাকলায় গ্রামের একজন প্রবীণ ব্যক্তি রূপেন্দ্রফার কাছ থেকে। জমি নির্বাচনসহ অন্যান্য বিষয়ে লুইনের বর্ণনায়ও অনুরূপ তথ্য রয়েছে (Lewin 1869:11)।

১৫ বিভিন্ন জাতের ধানের মধ্যে কোনটা আগে পাকে, কোনটা দেরীতে। এগুলো কোন্টা কি পরিমাণ ফলানো হবে, তা কিছুটা নির্ভর করে জুমিয়া কৃষকের কত তাড়াতাড়ি কি পরিমাণ ফসল ওঠানো দরকার, তার উপর। লক্ষণীয় যে, জুমের নানান জাতের ফসল বিভিন্ন মেয়াদে পূর্ণতা লাভ করায় ফসল তোলার জন্য সচরাচর পারিবারিক শ্রমই যথেষ্ট। তবে জুম-চক্রের কোন কোন পর্যায়ে যখন একসাথে প্রচুর শ্রমের প্রয়োজন হয়, তখন পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আত্মীয়-প্রতিবেশীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শ্রমের জোগান পাওয়া সম্ভব। জুম-চক্রের এই মুহূর্তগুলোতে উৎসবমুখরতা লক্ষ্য করা যায়।

১৬ খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের 'পাঁচ মাইল' নামক স্থানে সত্তরের দশকে সরকারী উদ্যোগে যখন একটি 'যৌথ খামার' প্রকল্প চালু করা হয়, তখন সেখানে একটা বাদুড়ের গুহা ছিল, যা আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। তবে বাদুড়ের গুহা এড়িয়ে চলার প্রথা লঙ্ঘনের ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল, তা আমার জানা নেই।

১৭ একটা রাষ্ট্রের কোন প্রান্তিক অংশকে ঘিরে কিভাবে আভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতা কাজ করে, এ সংক্রান্ত বিশ্লেষণের উদাহরণ হিসাবে Hechter (1975)-এর কাজ দেখা যেতে পারে।

১৮ 'জুম্ম' শব্দটার ব্যবহার অবশ্য চাকমা ভাষা ছাড়া অন্যান্য পাহাড়ী গোষ্ঠীদের ভাষায় সাধারণভাবে গৃহীত হয় নি। চাকমা ভাষার বাইরে মূলতঃ জনসংহতি সমিতি ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর প্রচারণাতেই 'জুম্ম' শব্দটির ব্যবহার সীমিত রয়ে গেছে।

১৯ অনেক আগে শোনা গানগুলি স্মৃতি থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কাজেই কথা বা বানানে কিছু গরমিল থাকতে পারে।

২০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একজন পাহাড়ী ছাত্র সম্প্রতি তার নিজের পর্যবেক্ষণ হিসাবে আমাকে যে তথ্য দিয়েছে, তাতে মনে হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা শান্তিবাহিনী, উভয় পক্ষ থেকেই জুমচাষকে বাধা দেওয়ার একটা প্রধান কারণ ছিল সামরিক কৌশলগত বিবেচনা। সেনাবাহিনীর দৃষ্টিতে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা জুমচাষীদের সহায়তায় গেরিলা তৎপরতা চালানোর সুযোগ পেত। আবার শান্তিবাহিনীর দৃষ্টিতে যেখানে সেখানে জুমচাষ করা হলে জঙ্গলের আড়ালে যাতায়াতের সুবিধা কমে যেত।

তথ্যসূত্র

ত্রিপুরা, প্রশান্ত (১৯৯৩) আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ ও বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ। আন্তর্জাতিক বিশ্ব আদিবাসী বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনানুষ্ঠানে পঠিত মূল প্রবন্ধ, ডিসেম্বর ১৮, ১৯৯৩, ঢাকা।

--------(১৯৯৮) পাহাড়ি গোষ্ঠীপরিচয়ের ঔপনিবেশিক ভিত্তি। ভেলাম ভান সেন্দেল ও এলেন বল সম্পাদিত *বাংলার বহুজাতি,* দিল্লি: ইন্টারনেশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, পৃ.৮৭-১০১।

বসু, রাজশেখর (১৩৮০ বাংলা) *চলন্তিকা: আধুনিক বঙ্গ ভাষার অভিধান,* কলিকাতা।

ভান সেন্দেল, ভেলাম, সম্পা: (১৯৯৪) *দক্ষিণপূর্ব বাংলায় বুখানন (১৭৯৮): কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর ভ্রমণ।* অনুবাদ: সালাহউদ্দীন আইয়ুব। ঢাকা: ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ।

--------(১৯৯৮) 'জুম্মা'দের আবিষ্করণ: দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের রাষ্ট্র সংগঠন ও জাতিগোষ্ঠী রূপায়ণের আলেখ্য। ভেলাম ভান সেন্দেল ও এলেন বল সম্পাদিত *বাংলার বহুজাতি,* দিল্লি: ইন্টারনেশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, পৃ.১০২-১৫১।

মে, ভল্ফগাং (১৯৯৬) *পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌমসমাজ: একটি আর্থ-সামাজিক ইতিহাস।* কলকাতা: ইন্টারন্যালশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ।

Anderson, B. (1991) *Imagined Comminites*. 2nd Edition (Orig. 1983). London: Verso

Barth, F. (1956) Ecological Relations of Ethnic Groups in Swat, North Pakistan. In *American Anthropologist*, 58(6):1079-89

Beckerman, S. (1983) Does the Swidden Ape the Jungle? *Human Ecology* Vol. 11, No. 1, pp.1-11.

Bertocci, P. J. (1984) Resource Development and Ethnic Conflict: Chittagong Hill Tribes of Bangladesh. In *Tribal Cultures in Bangladesh,* ed. M. S. Qureshi, Rajshahi: IBS, Rajshahi University, pp. 345-361.

Childe, V. Gordon (1941) *Man Makes Himself.* London.

Conklin, H. (1957) *Hanunoo Agriculture: Report on an Integral System of Shifting Cultivation in the Philippines.* FAO Forestry Development Paper No. 12. Rome: FAO.

Despers, L., ed. (1975) *Ethnicity and Resource Competition in Plural Societies.* The Hague: Mouton.

Devlopment Commissioner (1967) *Report on Industrial Potentiality Survey in Nagaland.* India.

Dewan, A.K. (1990) *Class and Ethnicity in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh.* PhD Dissertation, McGuill University.

Dumond, D. E. (1961) Swidden Agriculture and the Rise of Maya Civilization. In *Environment and Cultural Behaviour*, ed. A. P. Vayda. New York. (Originally published in *Southwestern Journal of Anthropology*, Vol. 17, 1961)

Ganguly, J. B. (1968) *Economic Problems of the Jhumias of Tripura.* Calcutta: Bookland Private Ltd.

Geertz, C. (1963) *Agricultural Involution.* Berkeley: University of California Press.

Greenland, D. J. (1975) Bringing the Green Revolution to the Shifting Cultivator. *Science*, Vol. 190:pp.841-845

Hechter, M. (1975) *Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development, 1536-1966.* London: Routledge & Kegan Paul

Hutchinson, R.H.S. (1906) *An Account of the Chittagong Hill Tracts.* Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot.

Hobsbawm, E. and T. Ranger, eds. (1983) *The Invention of Tradition.* Cambridge: Cambridge University Press.

Jahangir, B. K. (1984) Tribal Peasants in Transition: Chittagong Hill Tracts. In *Tribal Cultures in Bangladesh,* ed. M. S. Qureshi, Rajshahi: IBS, Rajshahi University, pp.287-295. [Originally published in 1979, *Economic and Political Weekly,* Vol. XIV, No. II, pp.598-600]

Lewin, T. H. (1869) *The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers Therein.* Calcutta: Bengal Printing Co., Ltd.

Loeffler, Lorenz G. (n.d.) Ecology and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts: Report on a short visit to Banderban and Rangamati. (Unpublished typescript)

McKenzie, A. (1884) *History of the Relations of the Government with the Hill Tribes of the North-East Frontier of Bengal.* Reprinted in 1979, Delhi: Mittal Publications.

Mohsin, A. (1997) *The Politics of Nationalism. The Case of the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh.* Dhaka: University Press Limited.

Pouchepadass, J. (1998) British Attitudes Towards Shifting Cultivation in Colonial South India: A Case Study of Soth Canara District 1800-1920. In *Nature, Culture, Imperialism: Essays on the Environmental History of South Asia,* ed. D. Arnold & R. Guha, pp.123-151. Delhi: Oxford University Press.

Roosens, Eugeen E. (1989) *Creating Ethnicity. The Process of Ethnogenesis*. Newbury Park: Sage.

Roy, Raja Devashish (1994) Patterns of Land use in the Chittagong Hill Tracts: Prospects and Problems. In *Holiday* (Weekly), August 19, 1994, Dhaka.

Selections (1887) *Selections from the Correspondence on the Revenue Administration of the Chittagong Hill Tracts, 1868-1887*. Calcutta: Bengal Secretariat Press.

Sopher, D.E. (1964) The Swidden/Wet-Rice Transition Zone in the Chittagong Hills. In *Annals of the Association of American Geographers*, 54 (I):107-26

Tripura, P. (1992) The Colonial Foundation of Pahari Ethnicity. *Journal of Social Studies,* 58:1-16.

----------and A. Naher (1994) Indigenous Peoples and Human Rights in Bangladesh. *Financial Express*, May 13 & 20, 1994, Dhaka.

---------and I. Ahmed (1994) 'Tribal'/'Non-Tribal': Discourses of Ethnicity in Bangladesh. In *Asian Studies* (Journal of the Department of Government and Politics, Jahangirnagar University, Dhaka), No. 13:pp.45-53.

van Schendel, W. (1992) The Invention of the 'Jummas': State Formation and Ethnicity in Southwestern Bangladesh. In *Modern Asian Studies*, 6(I):95-128.

---------, ed. (1992) *Francis Buchanan in Southeast Bengal (1798). His Journey to Chittagong, the Chittagong Hill Tracts, Noakhali and Comilla.* Dhaka: University Press Limited.